২৪৭

ভোরের কাগজ

তারিখ APR. 1.7 1999
পৃঃ ৫ কলাম ২

নিঃসঙ্গ বচন

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ধর্ম শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা

১.

১৯৭১ সালের মে মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা আমার বাবাকে একটা নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছিল। যারা ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তারা আমাদের বলেছেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আমার বাবা দুহাত তুলে খোদার কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, 'খোদা আমি তোমাকে সময়মতো ডাকতে পারিনি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।' তারপর বলেছিলেন, 'খোদা তুমি আমার ছেলেমেয়েদের রক্ষা করো।'

এই ঘটনাটির কথা আমি কখনো ভুলতে পারি না। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন দেশটুকুকে গ্রাস করে আনছে, পুরো অঞ্চলটিই যখন একটি বধ্যভূমি ঠিক তখন সহায়, সম্বলহীন, আত্মীয়-স্বজনহীন, আশ্রয়হীন একজন স্ত্রী, কিছু শিশু-কিশোর-কিশোরী পুত্র কন্যাকে ফেলে রেখে রাইফেলের কালো এবং শীতল নলের সামনে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে কেমন লাগে আমি জানি না। কিন্তু সেই ভয়ংকর মুহূর্তটিতেও ভেঙে না পড়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমাভিক্ষা করে তার অসহায় সন্তানদের তার কাছে সঁপে দিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার ভিতরে যে অবিশ্বাস্য শক্তি এবং সাহসের প্রয়োজন রয়েছে সেটি একজন মানুষের ভিতরে আসতে পারে সৃষ্টিকর্তার প্রতি একটি গভীর বিশ্বাস থেকে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে সদস্যরা আমার বাবাকে হত্যা করেছিল স্বাধীনতার পর তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়েছিল— তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সেই যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করে সসম্মানে দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে না দিলে এই দেশের মাটিতেই তাদের বিচার হতে পারতো। আমরা সেই হত্যাকারী সেনাবাহিনীর সদস্যদের নাম-পরিচয় জেনেছিলাম। তারা কেন আমার বাবাকে হত্যা করেছিল সেটাও আমরা জানি। 'পাকিস্তান' নামক একটি দেশকে রক্ষা করে 'ইসলাম'কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

একটি ধর্মের নাম ব্যবহার করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমার বাবার প্রতি পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম অবিচারটি সম্পন্ন করেছিল। আমার বাবা সেই ভয়ংকর অবিচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের ভিতরে অবিশ্বাস্য এক ধরনের শক্তি অনুভব করেছিলেন সেই একই ধর্মের ভিতরে। মানুষের জীবনে এর থেকে বড়ো কোনো অসঙ্গতি (Contradiction) থাকতে পারে বলে আমার জানা নেই।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা ধর্মের ব্যাপারে এটাই হচ্ছে গোড়ার কথা : ধর্ম এবং সৃষ্টিকর্তাকে গ্রহণ করে একজন মানুষ নিজের ভিতরে শান্তি এবং শক্তি খুঁজে পেতে পারে। আবার সেই একই ধর্ম ব্যবহার করে একটি সংঘবদ্ধ দল পৃথিবীতে বিভীষিকার প্রলয়কাণ্ড শুরু করে দিতে পারে।

ধর্ম গ্রহণ এবং ধর্ম ব্যবহার দুটি পুরোপুরি ভিন্ন জিনিস।

২.

পৃথিবীর সকল দেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষেরা যেরকম উৎসাহ নিয়ে বিজ্ঞান-গণিত-প্রযুক্তি-শিল্প-সাহিত্য-দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন প্রায় সে রকম উৎসাহে ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সেটা অনুপস্থিত। আমাদের দেশের শিক্ষিত-জ্ঞানী-গুণী মানুষদের ধর্ম নিয়ে এক ধরনের ঔদাসীন্য রয়েছে, যার কারণে ধর্মের বা ধর্ম ব্যাখ্যার পুরো ব্যাপারটি চলে গেছে এক ধরনের অশিক্ষিত, অসহিষ্ণু গোঁড়া রক্ষণশীল মানুষের কাছে এবং তার চেয়েও যেটি ভয়ংকর— উদ্দেশ্যপরায়ণ রাজনৈতিক ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাতে। সম্ভবত সেই কারণেই শুদ্ধ বাংলায়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং কোনো ধরনের কুসংস্কার ছাড়া লেখা ধর্মীয় অনুশাসনের একটি বইও এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষিত, জ্ঞানী-গুণী সম্প্রদায়ের ধর্মের ব্যাপারে ঔদাসীন্যর কারণ কী হতে পারে? ব্যাপারটি জটিল এবং নিশ্চিতভাবেই আমার বিশ্লেষণ ক্ষমতার বাইরে। সাধারণভাবে চিন্তা করে দুএকটি সহজ কারণ দেখানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথমত হয়তো শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে ধর্ম ব্যাপারটিকে একটি অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলে মনে হতে পারে। বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে চুলচেরা গাণিতিক বিশ্লেষণ এবং যুক্তিতর্ক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে— অন্যদিকে ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। কাজেই বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে একবার যুক্তিবাদী মন গড়ে তুললে সম্ভবত বিশ্বাসভিত্তিক ব্যাপার গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া যায় না। এ কারণে আজকাল প্রায় হঠাৎ করেই বিজ্ঞান ব্যবহার করে ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করার এক ধরনের চেষ্টা শুরু হয়েছে। [মরিস বুকাই, দি বাইবেল দি কোরআন এ্যান্ড সায়েন্স] ধর্মগ্রন্থের যে সব ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞানের সূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রমাণ করা যায় সেগুলোকে সংকলিত করে প্রকাশ করা হয়।

এ ধরনের লেখালেখি নিয়ে আলোচনায় না গিয়ে আজ দুটি ছোট উদাহরণ দেই। বিজ্ঞানী আবদুস সালাম এই শতাব্দীর একজন অন্যতম তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী, উইক ইন্টারঅ্যাকশান এবং বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় শক্তি নামে প্রকৃতির দুটি মূল শক্তিকে একই শক্তির দুটি ভিন্ন রূপ প্রমাণিত করে তিনি পৃথিবীর পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেকে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিজ্ঞানের যুক্তিতর্ক, গাণিতিক বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে তিনি সুপরিচিত, তার সকল মেধা-প্রতিভা এবং সৃজনশীলতা বিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি সম্পৃক্ত। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী আবদুস সালাম ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন। বৈজ্ঞানিক কনফারেন্সের শুরুতে তিনি স্লাইডের ওপর আরবি ভাষায় 'পরম দয়ালু ও করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে শুরু করছি' লিখে শুরু করতেন। দেশী বিদেশী বিজ্ঞানীরা সেটাকে বিজ্ঞানের কোনো অজানা সূত্র মনে করে প্রায় সময়ই কৌতূহল প্রকাশ করতেন। প্রফেসর আবদুস সালামের সৃজনশীল যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী মন যদি একই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে তাহলে সাধারণ মানুষের পক্ষেও সেটি সম্ভব বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়টি উদাহরণটি একটি সহজ উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তবুদ্ধির মানুষেরা বেশ দাপট নিয়ে বাস করেন— বাইরের পৃথিবীতে তারা যতো অন্যায় অবিচারই করে থাকুক না কেন নিজের দেশে সকলের সমান অধিকারের একটি ব্যাপার আছে। এই দেশের মূল কাঠামোটি গড়ে উঠেছে আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে ভিত্তি করে। এই দেশটিতে যখন প্রথমবার মুদ্রাব্যবস্থা (Currency) চালু করার চেষ্টা করা হয়, একাধিকবার চেষ্টা করার পরও সেটি ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন তারা প্রায় তাদের সকল Currency-তে মুদ্রিত করে দেয়, 'In God we trust'-আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি। এরপর থেকে তাদের মুদ্রাব্যবস্থা চালু হয়ে যায় এবং এখনো সেই দেশের প্রতিটি মুদ্রা বা নোটে এই কথাটি লেখা রয়েছে। সেই দেশের সকল ধর্মের সকল মানুষ, তাদের সবচেয়ে মূল্যবান দলিলে এই বাক্যটিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কট্টর বিজ্ঞানী বা ঘোর নাস্তিক কারোই সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি।

বিজ্ঞানী মন নিয়ে ধর্মকে গ্রহণ করার এই দুটি উদাহরণ কারো কাছে লঘু বলে মনে হলে তাদের জন্য আরো একটি তথ্য উপস্থাপন করা যায়। ট্রিপল বাইপাস সার্জারি, মোবাইল টেলিফোন বা স্যাটেলাইট ডিশের মতো 'চমকপ্রদ' ব্যাপার দেখে আমাদের সবারই বিজ্ঞানের প্রতি এক ধরনের বিশ্বাস এবং আস্থা রয়েছে। প্রায় অশালীন এবং অশুদ্ধ বাংলায় লেখা আমাদের দেশের ধর্মীয় অনুশাসনের অনেক বইয়ে ঘোর অবৈজ্ঞানিক একটি উপদেশ দিয়ে তার নিচে বড়ো বড়ো করে লিখে দেওয়া হয় "বিজ্ঞানী মতে"! বিজ্ঞানের ওপর সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের এই বিশ্বাসের কারণ এটি গড়ে উঠেছে গণিতের নিশ্ছিদ্র যুক্তি-তর্কের ওপর ভিত্তি করে। ১৯৩১ সালে কার্ট গোডেল (Kurt Godel), বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহকর্মী, পৃথিবীর একজন সেরা গণিতবিদ- একটি অত্যন্ত আপত্তিকর জিনিস প্রমাণ করে ফেললেন। তিনি প্রমাণ করলেন গণিতের নিশ্ছিদ্র বিশ্লেষণের আড়ালে বিশাল ফাঁক রয়েছে। গণিতের অনেক

> পৃথিবীর সকল দেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষেরা যেরকম উৎসাহ নিয়ে বিজ্ঞান-গণিত-প্রযুক্তি-শিল্প-সাহিত্য-দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন প্রায় সে রকম উৎসাহে ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সেটা অনুপস্থিত। আমাদের দেশের শিক্ষিত-জ্ঞানী-গুণী মানুষদের ধর্ম নিয়ে এক ধরনের ঔদাসীন্য রয়েছে, যার কারণে ধর্মের বা ধর্ম ব্যাখ্যার পুরো ব্যাপারটি চলে গেছে এক ধরনের অশিক্ষিত, অসহিষ্ণু গোঁড়া রক্ষণশীল মানুষের কাছে।

Theorem কখনোই গণিতের কাঠামোর ভিতরে থেকে প্রমাণ করা যাবে না। গোডেলের এই আবিষ্কারটিকে গণিতের ইতিহাসে গত ১ হাজার বছরের সবচেয়ে চমকপ্রদ আবিষ্কার বলে অভিহিত করা হয়। [Michio Kaku, Hyperspace, Anchor Books, 1994, Page 142]

কাজেই ধর্মকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড় করানো যায় না বলে যারা বিজ্ঞান এবং গাণিতিক বিশ্লেষণকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে এসেছেন তাদের জন্য এটি বেশ বড়ো দুঃসংবাদ। গণিতের অনেক Theorem-কে কখনোই প্রমাণ করা যাবে না প্রমাণিত হওয়ার পরও আমরা যদি গণিত শাস্ত্রে বিশ্বাস হারিয়ে না ফেলি তাহলে নিশ্চয়ই ধর্মের মতো সমাজের এতো বড়ো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের কৌতূহলী হওয়ার প্রয়োজন আছে।

বিজ্ঞানকে দিয়ে সৃষ্টিকর্তা এবং ধর্ম ইত্যাদিকে প্রমাণ করার জন্য কিছু কট্টর বিজ্ঞানী (hard core) বেশ পরিশ্রম করেছেন। ফ্রাঙ্ক টিপলার নামে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী "ফিজিক্স অফ ইমমর্টালিটি" Anchor Books, 1994] নামে একটি বই লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বইয়ের সহজপাঠ্য অংশটুকু পড়া আনন্দদায়ক কিন্তু কঠিন সমীকরণ কন্টকিত কসমোলজির অংশটুকু পড়া রীতিমতো পরিশ্রমের ব্যাপার বলে আমি ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখেছি।

আমাদের দেশের জ্ঞানী-গুণী এবং বুদ্ধিজীবীদের ধর্ম সম্পর্কে ঔদাসীন্যের কারণ অন্যত্র হতে পারে বলেও আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতায় পাশ্চাত্য জগতের একটি বড়ো অবদান রয়েছে বলে আমরা তাদের চিন্তাধারা এবং দর্শনকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। সেটি এমন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে আছে যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও এই দেশের মানুষ নানা ধরনের পীড়ন থেকে বঞ্চিত করেননি! আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ হয়েছে পাশ্চাত্য রীতিতে এবং পাশ্চাত্যে ইসলাম ধর্মকে তার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। নিউ এবং ওল্ড টেস্টামেন্টভিত্তিক দুটি ধর্মকে (খ্রিস্টিয়ানিটি এবং জুডাইজম) সম্ভ্রান্ত ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হলেও তুলনামূলকভাবে আধুনিক পবিত্র কোরআন ভিত্তিক ইসলাম ধর্মকে প্রায় কাল্ট (Cult) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যাপারটি কতোটুকু গুরুতর সেটি বোঝার জন্য আসলে কিছুদিন পাশ্চাত্য দেশে বসবাস করার প্রয়োজন হয়। সেখানকার জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে দুশ্চরিত্রগুলোও সাধারণত মুসলমান চরিত্রের হয়ে থাকে। গত বছর প্রদর্শিত এরকম একটি ছায়াছবি The siege যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল। আফগানিস্তানের তালেবান, আলজিরিয়ায় নৃশংসতা বা পাকিস্তানের গণহত্যা মোটামুটিভাবে সাম্প্রতিক ব্যাপার হলেও মুসলমান ধর্মকে হেয় প্রমাণ করার ব্যাপারটি চলে আসছে প্রায় হাজার খানেক বছর থেকে। মুসলমানদের বিশ্বাস বা সংস্কৃতির প্রতি অসৌজন্যতা প্রকাশ করার পাশ্চাত্য কালচারের সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টি সালমান রুশদি। তার স্যাটানিক ভার্সেস বইটিতে তিনি ইসলাম সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন (মোটামুটি অসম্মানজনকভাবে) তার কোনোটিই সালমান রুশদির নিজের প্রশ্ন নয়। ইউরোপ থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করায় ক্রুসেড চলাকালীন থেকে শুরু করে তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের লেখালেখিতে হুবহু এই প্রশ্নগুলো করে ইসলাম ধর্মকে হেয় করা হতো। পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মানিত কবি দান্তের The Divine Comedy কাব্যগ্রন্থে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে নরকের অষ্টম বৃত্তে বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করার দৃশ্য বর্ণনা করা আছে। (ইউরোপের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী এবং দার্শনিকদের মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধাচরণের একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা পাওয়া যায় Karen Armstrong এর লেখা Muhammad বইটির প্রথম পরিচ্ছেদে [Karen Armstrong, Muhammad, Harper Collins] দান্তে এবং তাদের মতো বড়ো বড়ো কবির অবদানসহ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করা এবং নিজ ধর্মের

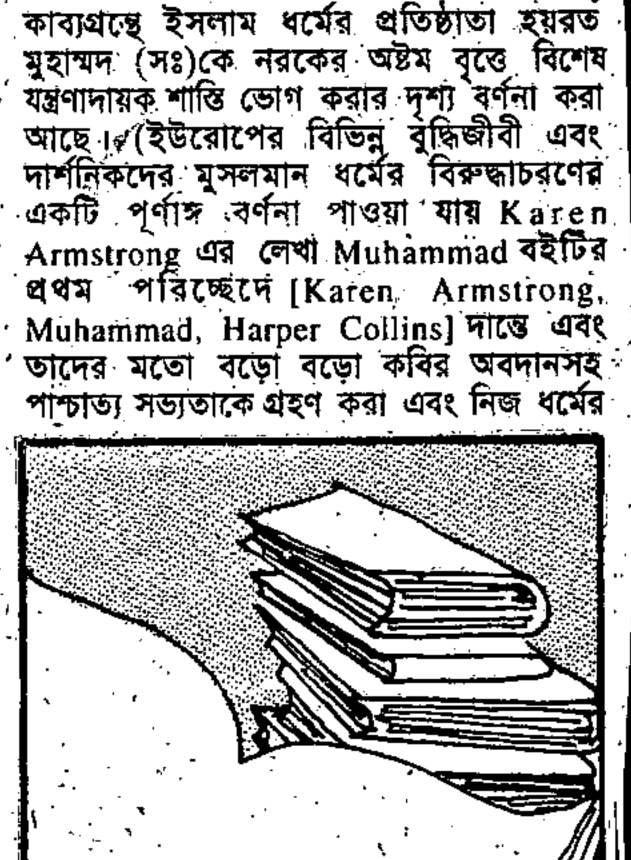

প্রতি ভালোবাসা রাখার বিভ্রান্তিতে না গিয়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোই বন্ধ করে দিয়েছেন।

এর জন্য আমাদের বড়ো ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। হেফজুর রহমান ও শামসুন নাহারের ভরণপোষণের মামলা চলাকালীন মুসলমান ধর্মের রীতিনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের আদালতে আনা হয়, তারা ছিলেন মদীনা নামক একটি ধর্মীয় পত্রিকার সম্পাদক এবং বায়তুল মুকাররমের খতিব। বাংলাদেশের প্রগতিশীল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ইসলাম ধর্মের বিশেষজ্ঞ একজনকেও পাওয়া গেলো না। এটি খুব দুঃখজনক। সুপ্রিম কোর্টের রায় যে বাংলাদেশের নিগৃহীত মহিলাদের বিপক্ষে গিয়েছে [সুলতানা কামাল, সেদিনের শাহবানু আজকের শামসুন নাহার, ভোরের কাগজ, ১৪ই অক্টোবর ১৯৯৮] সে জন্য কী ঘটনাক্রমে আমরাই দায়ী নই?

৩.

দেশের সহিষ্ণু এবং শিক্ষিত মানুষেরা ধর্মচর্চার ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ না করলে কী ক্ষতি হতে পারে? এ ব্যাপারে একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। গত বছর পল্লবীর একটি মসজিদে ঈদের জামাতের শেষে দোয়া করার সময় ইমাম সাহেব অন্যান্য ধর্মের মানুষকে গালাগাল শেষ করে কোনো একটি সূত্র ধরে ঘোষণা করলেন, ঈদের জামাতে তার এই দোয়া কবুল করার ফলশ্রুতিতে এখানে উপস্থিত সকল মানুষের সকল পাপ আল্লাহতায়ালা মাফ করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র মাফ চেয়ে সকল পাপ ঢালাওভাবে মাফ করিয়ে নেওয়ার এই অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিটি প্রকৃতপক্ষে অপরাধ করার ব্যাপারটিকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। বেশ কিছু অপরাধ জমা হওয়ার পর তার জন্য মাফ চেয়ে নিলেই হবে— এই পদ্ধতিটি একজন ঘাগু অপরাধীর বিবেকের জন্য অত্যন্ত সহজ সমাধান হতে পারে, কিন্তু একটি সমাজের জন্য কিছুতেই ভালো হতে পারে না। এই বছর একই মসজিদে একই সময়ে একই ইমামের দোয়া শুনে

রীতিমতো আতংকিত হয়ে উঠলাম, কার
ঘোষণা করলেন, কোনো একটি বিশেষ
শুধু যে প্রত্যেকের সকল পাপ মাফ হয়ে
তাই নয়, প্রত্যেক মানুষের পাপকে পুণ্য হিসে
রূপান্তর করে দেওয়া হয়েছে। আমি নিশ্চি
ঈদের জামাতে উপস্থিত চোর-ডাকাত-খুনি এব
ধর্ষণকারীরা আমাদের মতো নিরীহ মানুষদের থেকে অনেক বেশি উল্লসিত হয়েছিলেন কারণ পুণ্যে রূপান্তর করার জন্য তাদের কাছে অনেক বড়ো বড়ো পাপ সঞ্চিত ছিল। তাদের তুলনায়— পাপ করেননি বলে নিরীহ মানুষেরা নিশ্চিতভাবেই প্রতারিত হওয়ার অনুভূতি পেয়েছিলেন সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

কিছুদিন আগে আমার কাছে একটি ধর্মবিষয়ক পত্রিকা এসেছে, কৌতূহলী হয়ে খুলে আবিষ্কার করেছি এক জায়গায় লেখা রয়েছে, 'প্রকৃত মুসলমানদের সব সময় জিহাদ করতে হয়।' আমার এই তথ্যটি জানা ছিল না বলে আমার পরিচিত ধর্মপ্রাণ সহকারীদের সঙ্গে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করার পর তারা আমাকে বলেছেন এই জিহাদ আসলে অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম— তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু যারা ধর্মকে ব্যবহার করতে চায় তারা খুব সহজেই এটিকে সত্যিকারের একটি রক্তক্ষয়ী জিহাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা তরবারি থেকে রক্ত ঝরছে এরকম পোস্টার দেখেছি, হত্যাকাণ্ড বা খুন জখম ব্যাপারগুলো গ্রহণযোগ্য করে ফেলার জন্য এগুলো খুব কার্যকর পদ্ধতি হওয়া সম্ভব। বাংলাদেশের প্রগতিশীল প্রায় সকল বুদ্ধিজীবীকে ধর্ম ব্যবসায়ীরা কখনো না কখনো মুরতাদ ঘোষণা করেছেন। এই মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার ডাক দিয়ে দেওয়া হলে হঠাৎ করে নরহত্যার মতো ব্যাপারটিও একটি ধর্মীয় এবং পুণ্যের কাজ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিছুদিন আগে কবি শামসুর রাহমানকে আক্রমণের ব্যাপারটি ঠিক এই ধরনের একটি ব্যাপার। যারা এটি করেছে তাদের গ্রেপ্তার করে বা শাস্তি দিয়ে এই সমস্যা মেটানো যাবে না, কারণ যারা এটি করেছে তারা এটিকে পুণ্যের কাজ মনে করেই করেছে। এই সমস্যার কোনো সহজ সমাধান নেই; মানুষকে একেবারে শৈশব থেকে ধর্মের প্রকৃত সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচয় করানোই হচ্ছে এর সমাধান।

অশিক্ষিত কিংবা উদ্দেশ্যপরায়ণ মানুষের হাতে ধর্ম আসলে সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের ধর্মের প্রতি ভালোবাসা থেকে অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা এবং অবহেলা সেখানে অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। আমার সন্তানেরা যে স্কুলে যায় সেখানে সোজাসাপটাভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে মুসলমান ছাড়া অন্য সবাই সরাসরি নরকবাসী হবে। মাদার তেরেসা কিংবা মহাত্মা গান্ধীও এই নির্মম বিচার থেকে রেহাই পাননি। একটি ছোট শিশুর মনকে সারা জীবনের জন্যে কলুষিত করে দেওয়ার জন্য এর চেয়ে সহজ পদ্ধতি আর কী হতে পারে?

আমাদের আশপাশে মোটামুটি প্রগতিশীল এবং সহিষ্ণু মানুষদের মাঝেই আমরা যদি এই ধরনের বিকট সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মের অপব্যবহারের চিহ্ন খুঁজে পাই তাহলে আমাদের অগোচরে দেশের সাধারণ মানুষকে নিয়ে কি ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে সেটা অনুমান করতে কোনো অসুবিধা হয় না। ধর্মের সৌন্দর্য নয়, ভালোবাসা নয়, তার অন্তর্নিহিত শক্তি নয়, সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে ঘৃণা, জিঘাংসা এবং সন্ত্রাস।

যে যাই বলুক এর পুরো দায়দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের।

৪.

ধর্মকে যারা ব্যবহার করছে তার মাঝে শুধু যে অশিক্ষিত এবং উদ্দেশ্যপরায়ণ ধর্ম ব্যবসায়ী রয়েছে সেটি সত্যি নয়, এই তালিকায় সবচেয়ে উপরে রয়েছেন আমাদের সম্মানিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। প্রেসিডেন্ট এরশাদের উত্থান, শাসনকাল এবং পতনের পুরো সময়টুকুতে আমি দেশের বাইরে ছিলাম বলে ব্যক্তিগত জীবনে অসততাকে মূলধন করে ভণ্ডামি এবং প্রতারণা দিয়ে শাসনকার্য চালিয়ে কিভাবে তিনি মুখে ইসলামের বুলি আওড়ে গেছেন সেটি স্বচক্ষে দেখার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। তার শাসনামলেই ধর্মকর্ম এবং পীরদের লালন-পালনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি সমার্থক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। বিএনপির নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে এই দেশে ধর্ম পালন করা কঠিন হয়ে যাবে বলে অসংখ্যবার ঘোষণা করেছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে "মসজিদে আর আজান শোনা যাবে না, তার বদলে উলু ধ্বনি শোনা যাবে"। তাদের এই উক্তিটি অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ এখানে নিজের ধর্মের জন্য মমতা থেকে হিন্দু ধর্মের প্রতি বিদ্বেষটুকু অনেক বেশি স্পষ্ট। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দও এতোটুকু কম যান না, বিএনপির কোনো একটি অভিযোগের প্রত্যুত্তরে একবার প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, "তিনি রোজা রেখে কখনোই মন্দিরে যাননি"। তিনি সকল ধর্মের মানুষের প্রধানমন্ত্রী। তিনি যদি রোজা রেখেও হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য মন্দিরে যেয়ে থাকেন সেটি একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার নোংরা খেলায় খেলতে নেমে গেলে হঠাৎ করে হৃদয় থেকে শুভ অনুভূতিগুলো কেমন করে জানি উবে যায়।

একটি দেশে রাজনৈতিক দলগুলো সত্যিকার অর্থে দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন সৃষ্টি করে। তারা যদি চায় তাহলে দেশের সকল মানুষের ভিতরে একটি